বিশেষ ভূমিকা ঃ

ব্রহ্মলাভের নানা পথ বৈচিত্র্য

সাধন প্রস্তুতি ঃ সাধনা স্বাতন্ত্র্যে বিধৃত। প্রত্যেকের সাধনমার্গ স্বতন্ত্র। একই সাধারণ-ধারার মধ্যে থেকেও প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ ধরেই এগিয়ে চলেন। একটি সাধারণ ধারার সাধনাপ্রবাহ থেকেই সূত্র ও রসদ আহরণ করে ব্যক্তি ক্রমশঃই তার সাধনক্ষেত্রের মধ্যে এগিয়ে চলেন। ব্যক্তির এগিয়ে চলার পর্বে উপাদানগুলি আসে দু'ভাবে ঃ ব্যক্তির অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ থেকে। একই বৈষ্ণবধারার সব সাধকই একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন মেনে চলেন না। শাক্ত ধারার ক্ষেত্রেও একই কথা। দু'জন শাক্ত পথগামীর ধারা এক নয়। দু'জনের সাধন ধারায় যেমন রয়েছে মৌলিক ঐক্য তেমনি ধারা দু'টি প্রচুর বৈসাদৃশ্যে ভরপুর। বেদান্তের ধারার ক্ষেত্রেও তাই। দু'জন বেদান্ত পথগামীর প্রত্যয় একই কিন্তু প্রত্যয়ের মাত্রার তফাৎ রয়েছে। তাই সাধন পথে এসেছে অনিবার্য বিভিন্নতা। ব্রহ্মের নিরঞ্জন, নির্বিশেষ রূপের সাধন ব্যক্তির নিজস্ব চৈতন্যস্তরের উপর নির্ভরশীল। সাধক যদি জাগ্রত চৈতন্যের অধিকারী হন তবে ব্রহ্মের প্রজ্ঞানরূপ, সৎ-চিৎ ও আনন্দরূপ তাঁর উপলব্ধির মধ্যে চলে আসে। অন্যথায় ব্রহ্মের চিন্তা, ভাবনা, উপলব্ধির হয় অন্য সোপান। ব্যক্তির চৈতন্যস্তরের উপরই নির্ভর করে ব্রহ্মপথযাত্রা। এক্ষেত্রেও ব্যক্তির সাধনসোপান এবং সাধনমার্গ স্বাতন্ত্র্যে বিধৃত হয়। অন্য আর সব মার্গের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক সাধকের সাধন পথ স্বতন্ত্র।

সাধনার পথ স্বতন্ত্র বলেই সাধনা ব্যক্তির অধীন। সাধনা সাংগঠনিক বা সমষ্টির পথে হয় না, এটি ব্যক্তিরই নিজস্ব। সংগঠন বা গোষ্ঠীর ভূমিকা অন্যত্র, ব্যক্তিকেই অর্জন করতে হয় সাধনধন। এই পথের সহযোগী শক্তি ও সাহচর্য দান করে গোষ্ঠী বা সংগঠনগুলি। ব্যক্তির প্রয়াস যাতে বাধাহীন হয়ে ওঠে এজন্য গোষ্ঠী বা সংগঠনকে উদ্যোগী হতে হয়। গোষ্ঠীর উদ্যোগ মূলতঃ বাতাবরণ সৃষ্টি বা উৎসাহ সংযোজনেই ব্যাপৃত। সংগঠনের নানা রূপ হতে পারে। এটি সমাজ বা রাষ্ট্রীয় স্তরের হতে পারে। সামাজিক স্তরের যে সমস্ত সংগঠন এদের সকলেরই ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য।

রামায়ণে আমরা দেখি রাষ্ট্র তার ভূমিকা কিভাবে পালন করছে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র এসেছেন মহারাজ দশরথের কাছে. রাজার কাছে প্রস্তাব পেশ করলেন জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর হাতে তুলে দিতে।

"সপুত্রং রাজশার্দূল রামং সত্যপরাক্রমম্।।
কাকপক্ষধরং বীরং জ্যেষ্ঠং মে দাতুর্মহতি।" (রামায়ণ, ১/১৯/৮, ৯)

সিংহের মত পরাক্রমশালী, সত্যস্বরূপী, অপরূপ রূপবান জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে আমার হাতে তুলে দিন—এই দাবি ঋষি বিশ্বামিত্রের। কারণ তপোবনের তপস্যা ও যজ্ঞকর্মে ঋষিদের সাধন পর্বে প্রবল বাধা সৃষ্টি ও অত্যাচার করছে পরাক্রমশালী রাক্ষসগণ। তাড়কা, মারীচ, সুবাহু ইত্যাদি অসংখ্যা রাক্ষসরা যজ্ঞকর্ম সম্পূর্ণ হবার মুখে উৎপাত সৃষ্টি করছে। যজ্ঞের অগ্নিতে উপর থেকে রক্ত, মাংস, বিষ্ঠা বর্ষণ করে যজ্ঞ পণ্ড করে দিচ্ছে ঋষিরা নিজেদের তপঃশক্তির প্রয়োগেই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারতেন। কিন্তু বিষয়টি রাজার এক্তিয়ার ভুক্ত তাই রাজার কাছেই দাবী। ঋষি বিশ্বামিত্রের যে কোন ইচ্ছা পূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও রাজা দশরথ এখন দ্বিধাগ্রস্থ। রামের বয়স মাত্র পনের বৎসর। তাছাড়া যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তার নেই। বিশাল রাক্ষস কুলকে প্রতিহত করা তার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়—দশরথের এরকমই বিশ্বাস। তাই তিনি ঋষির কাছে আর্জি জানালেন বিকল্পের। তিনি প্রস্তাব দিলেন স্বয়ং তিনি তাঁর লক্ষাধিক সৈন্য ও অন্যান্য বাহিনী নিয়েই যাত্রা করবেন রাক্ষসসংহারে। বিশ্বামিত্র বললেন কাজটি একমাত্র রামের পক্ষেই সম্ভব। অন্য কারোর পক্ষে এটি অসম্ভব তাই রামকেই চাই। তিনি রাজার ব্যবহারে বিরক্ত ও রুষ্ট হলেন। অবশ্য ঋষি বশিষ্টের হস্তক্ষেপে ও আশ্বাসে দশরথ রাজি হলেন। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম ও লক্ষ্মণ বনে গেলেন। বিভিন্ন আশ্রম ও পথ পরিক্রমার পর রামের রাক্ষসনিধনপর্ব শুরু হল। ভয়ঙ্কর তাড়কা দিয়ে শুরু। একের পর কে রাক্ষস দমন ও নিধন করে রাম ও লক্ষ্মণ ঋষিদের আশ্রমগুলিকে ভয়মুক্ত করলেন। ঋষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমটিকে সিদ্ধাশ্রম বলা হত। এখানে স্বয়ং ভগবান শ্রীবিষ্ণু বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করেছেন। বামন অবতারে ভগবান বামন এখানে বহুকাল যাবৎ তপস্যা করেছেন। ঋষি বিশ্বামিত্রেরও এটি তপোভূমি। তিনি তপস্যায় ও যজ্ঞকাজে রাক্ষসদের দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছিলেন। বৈদিক যজ্ঞ করলে যজ্ঞের সমস্ত প্রস্তুতি, অনুষ্ঠান শেষে যখন যজ্ঞাগ্নিতে আহুতির পর্বটি আসে তখনই মহা প্রতাপশালী রাক্ষসরা এসে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। আকাশ থেকে কাঁচা মাংস, রক্ত, বিষ্ঠা ছুঁড়ে দেয় যজ্ঞের বেদিতে ও অগ্নিতে ফলে যজ্ঞ পূর্ণ হয় না।

দশরথের কাছে যখন মাত্র দশরাত্রির জন্য রামচন্দ্রকে চাইতে গিয়েছিলেন ঋষি বিশ্বামিত্র, তখনই তিনি রাজাকে বলেছিলেন, তপঃশক্তির প্রভাব খাটিয়ে ঋষিরা এসব দুর্বৃত্তকে সংহার বা ধ্বংস করতে সমর্থ, কিন্তু সেটা তিনি চান না। এটি রাজার কর্তব্য, রাজাকেই দায়িত্ব নিতে হবে। বস্তুতপক্ষে ঋষি বিশ্বামিত্রের সংগ্রহে যে সমস্ত বিশেষ ধরনের দিব্যাস্ত্র ছিল তার প্রয়োগেই রাক্ষস নিধন নিমেষে সম্ভব ছিল। বিশ্বামিত্র এসব অস্ত্র উজাড় করে রামচন্দ্রের হাতে মন্ত্রসহ অর্পণ করেন। প্রথম যুদ্ধটি রামচন্দ্র নিজ অস্ত্রে করেছিলেন—এটি তাড়কা রাক্ষসীকে বধ। এর পরবর্তী যুদ্ধ গুলিতে রাক্ষস নিধনে ব্যবহৃত অস্ত্রাদি বিশ্বামিত্রের দেওয়া। এসব অস্ত্রের প্রয়োগ ও প্রত্যাহার উভয়ই বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে শিখিয়ে দেন। রাবণ বধ, কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিৎ সহ অন্যান্য মহাবলশালী ও বরপ্রাপ্ত রাক্ষসদের নিধনকার্যে শ্রীরামচন্দ্র এসব দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ প্রভূত পরিমাণে করেছেন।

রাজার বা রাষ্ট্রের কর্তব্য ব্যক্তির জন্য একটি অধ্যাত্ম অন্বেষণের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে দেওয়া। আধুনিক যুগে রাষ্ট্রগুলি বেশিরভাগই হয়ে উঠেছে সেকুলার। ফলে রাষ্ট্র ব্যক্তির আন্তর্জাগরণের আনুকূল্য সৃষ্টি ব্যাপারে উদ্যোগী হতে উৎসাহী নয়। পক্ষান্তরে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জগতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ তেমন নেই। অধ্যাত্মপিপাসুর পক্ষে প্রতিরোধী শক্তিগুলির সমাবেশ ঘটেছে সমাজে, বাজারে। সমাজ ব্যবস্থার যে গ্রন্থি এখন প্রকট হয়েছে তার বেশিরভাগই দেনা-পাওনা বা কমার্স। কমার্সই ব্যক্তির জীবনকে গ্রাস করেছে। কমার্সের প্রভাব এসেছে সম্পর্কগুলির মধ্যে। দেনাপাওনার হিসেব নিকেশ চলে এসেছে জীবনের সব অঙ্গে, সব সম্পর্কের মধ্যে। পাওয়ার টানে টানে চলে দেওয়ার হিসাব। চাওয়া-পাওয়া দিয়ে চলেছে সম্পর্কের বিন্যাস। এটি জীবনের সবক্ষেত্রেই বর্তমান। ব্যক্তি বা সংস্থা উভয়েরই চলার মধ্যে ফুটে উঠেছে স্বার্থবোধের পীড়ন। স্বার্থ কতটা পূর্ণ হোল, সুরক্ষিত হোল তার উপরই ভিত্তি করে তৈরি হচ্ছে সম্পর্কের জালগুলি। অবশ্য এ সবই দাঁড়িয়ে আছে ব্যক্তির সমর্থনের উপর।

সাধনা ব্যক্তির ধন, তাই ব্যক্তিকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কমার্সের ভিত্তিতে যে সহযোগ জীবনের সবক্ষেত্র দাবী করে অধ্যাত্মক্ষেত্রেও সেটিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে কি না। ব্যক্তির ভিতরের প্রবৃত্তির উপরই নির্ভর করে নির্বাচনটি। বুঝে নিতে হবে কী চাই। চাওয়ার মধ্যে আর দশটা থাকলেই এসে যাবে অন্য নির্ভরতা। আর সে সূত্রেই কমার্স প্রশ্রয় পেয়ে যাবে। ভগবানকেই যিনি চান তাঁর দৃষ্টিতে অন্য আবিলতা থাকে না। বিরাট কিছু করব, নিজের প্রতিষ্ঠা বা নিজ পছন্দের জনের প্রতিষ্ঠা, বা অন্যান্য পাওনার হিসাব এই ব্যক্তির কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এসব দশরকম ব্যক্তির মধ্যে যতক্ষণ চলে—তা সে যে নামেই চলুক না কেন, ভগবান সেখান থেকে যোজন তফাতে। আর দশটার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চললে অন্য অনেক কিছু হতে পারে। নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা হতে পারে; বড় বড় উদ্যোগও সার্থক হতে পারে; নিজের মত ও মতস্রষ্টার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সবই হতে পারে কিন্তু ব্রহ্মলাভ থেকে যায় শুধুমাত্র অনুমান নির্ভর হয়ে।

ব্যক্তিকে চিনে নিতে হবে, বুঝে নিতে হবে কী চাই। বিশ্বামিত্র রাজা দশরথকে বলেছিলেন, যে সমস্ত ভীষণ রাক্ষসদের দমন ও বধ প্রয়োজন তা স্বয়ং দশরথ ও তাঁর কয়েকলক্ষ সৈন্য, হস্তিবাহিনী, রথবাহিনীর সাধ্য নয়; এ কাজটি একমাত্র রামই পারবেন। এরা সব রামের হাতেই বধ্য। পনের বছরের নবীন যুবক রাম একাই রাজা এবং তার লক্ষাধিক সৈন্যের বাহিনীর তুলনায় অনেক বেশি উপযুক্ত। কারণ তিনি স্বয়ং রাম, নবদূর্বাদলশ্যাম। রামেরই উদ্বোধন চাই। অন্তরের অন্তস্থলে রামচন্দ্রের উদ্বোধনই প্রস্তুত করে দেবে উন্মুক্ত সাধন মার্গ, ব্রহ্মলাভের উপযুক্ত সরণি।

সাধন সোপান ঃ সাধনার প্রথম পর্বটি নির্বাচন বা চয়েস। নির্বাচন যত সঠিক ও ঐকান্তিক হয়ে উঠবে সাধন পথটি হবে ততই মসৃণ ও মধুর। সাধনার দ্বিতীয় পর্বটি হোল

মনন। নির্বাচিত পথেই চলবে মনন পর্ব। মনন যোগের ধারায় ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবে। এটি ব্যক্তির আন্তর-প্রক্রিয়া। সাধনার তৃতীয় পর্বটি হোল অনুরাগ। অনুরাগে ভরপুর ব্যক্তি এখন শুধু আন্তর বাতাবরণই নয় একটি বাহ্যিক বাতাবরণও সৃষ্টি করেন। অনুরাগ ক্রমশঃই গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়ে নির্বাচিতকে একমাত্র করে তোলে। সাধনার চতুর্থ এবং শেষ পর্বটি হোল সমর্পণ। সমর্পণেই সাধকের বা ভক্তের যাত্রাপথের উদ্যোগের পরিসমাপ্তি। এরপর সাধক নিজ অস্তিত্বকে আর নিজস্বতার রঙে রাঙাবেন না। ক্রমশঃই বিলুপ্ত হয়ে একসময় পূর্ণ নির্বাসিত বা নির্বাপিত হয়ে যাবে স্বাতন্ত্র্যের দীপটি।

সাধনার প্রথম পর্ব ঃ নির্বাচন বা চয়েস্ ঃ নির্বাচনের ওপরই নির্ভরকরে সাধনপথ বা সাধনজীবন কেমন হবে। বিভিন্ন মতাশ্রয়ী ব্যক্তিরা তাঁদের স্ব স্ব মতানুযায়ীই নির্বাচন পর্বটি সারেন। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, শৈব ইত্যাদি মত বা পথের ব্যক্তিরা তাঁদের নিজ তত্ত্বানুযায়ী নির্বাচনটি করে থাকেন। নির্বাচনের বিভিন্ন দিক এবং মাত্রা থাকে। যেমন সাকার বা নিরাকার অথবা অন্য কিছু। যাঁরা ভগবানকে জীবনে চান, প্রাথমিক নির্বাচন পর্বটি তাঁরা পেরিয়ে এসেছেন। ঈশ্বর আছেন কী নেই; থাকলে কীভাবে আছেন ? এসব প্রশ্ন সাধকের কাছে অবান্তর। সাধক ঈশ্বরকে চান। ভগবানকেই চয়েস নিবেদন করেছেন। প্রাথমিক চয়েসটির মধ্যে যেমন রয়েছে সতর্ক অভিযান, তেমনিই অসতর্কতার প্রভাব। ভগবানকে চয়েস যিনি করেছেন, তিনি এখনও ভগবানকে একমাত্র করে তোলেননি। দু'একটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রেই নির্বাচনটি প্রকৃত অর্থবহ হয়ে ওঠে না। ভগবানকে চাওয়া বহু ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রতীকি হয়ে ওঠে। অন্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভগবানকে চাওয়ার সঙ্গে থাকে আরও অনেক কিছু চাওয়া। জাগতিক প্রতিষ্ঠা — অর্থ, প্রতিপত্তি, নাম, যশ ইত্যাদি ছাড়াও থাকে সূক্ষ্ম চাওয়ার দ্যোতনা। যেমন অন্য নাম বা প্রতীকের প্রতিষ্ঠার সূত্র ধরে নিজের অহংকে পুষ্ট করা। সেবা পরিষেবা বা ত্যাগের আঙ্গিকে নিজের রুচি বা আকাঙ্ক্ষার জীবনপত্তন। নির্বাচন পর্বে অহং সহযোগী ও প্রতিরোধী উভয় ভূমিকাই পালন করে।

অহং-এর সহযোগী ভূমিকার প্রথম কথা নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। নির্বাচন পর্বটি এখন ব্যক্তির কাছে জরুরী হয়ে ওঠে। কারণ ব্যক্তির অধ্যাত্মপিপাসা তাঁর অহং-এর সমর্থন ও সহযোগ পেয়ে যায়। ফলে নির্বাচনটি হয় ব্যক্তির সংস্কার, স্বভাব ও রুচির নিরিখে। অর্থাৎ সংস্কার, স্বভাব ও রুচির বিচারে যে পথটি এবং পথশেষের লক্ষ্যমাত্রাকে চিনে নেওয়া হয় সেটি ব্যক্তির অধ্যাত্ম উন্মেষের সহায়ক হয়। যাঁর বৈষ্ণব সংস্কার ও স্বভাব তাঁর পক্ষে বেদান্ত অনুপযোগী। নির্বাচনপর্বে অহং-এর দীপ্তি যুক্ত হলে বিচার ও পর্যালোচনার দ্বারা ব্যক্তি ক্রমশঃই সঠিক চয়েসের দিকে এগিয়ে চলবেন। সংস্কারকে অহং-এর আলো দিয়েই সহজে চেনা যায়। সংস্কার ব্যক্তির চরিত্র ও ব্যবহারে প্রতিফলিত হয়, দীপ্যমানও। সংস্কারের দু'রকম প্রভাব রয়েছে ঃ দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ী প্রভাব এবং অন্যটি স্বল্পমেয়াদী বা

অস্থায়ী প্রভাব। স্থায়ী প্রভাব বিস্তারিত হয় ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা, পক্ষান্তরে অস্থায়ী প্রভাব বিস্তৃত হয় ব্যক্তির ব্যবহারে। কোনও কোনও সময়ে ব্যবহার চরিত্র সম্মত হয়ে যায়, আবার নাও হতে পারে। চরিত্রানুগ ব্যবহার ব্যক্তিরপক্ষে চিরন্তনী। এটি ব্যক্তির অস্তিত্বজাত সত্যে বৃত। অন্যদিকে ব্যবহার যদি চরিত্র সম্মত না হয় তবে এটি ক্ষণস্থায়ী মাত্রা পায়। চরিত্র ব্যতিরেকী ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে আরোপিত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এটি ব্যক্তির স্বতন্ত্র চিন্তার বিক্ষেপ। বাইরের পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতি নজর রেখে ব্যক্তি যখন কোন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত নিজ ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করেন ও উপস্থাপন করেন তখনও ব্যবহারটি হয়ে ওঠে কৃত্রিম। ব্যক্তির স্বাভাবিক ব্যবহারটি চরিত্রসম্মত। যেমন মূলত ভাল মানুষ, সৎ মানুষ একটি সাময়িক প্রলোভনে পড়ে কোনও অন্যায় কাজ করলেন। এই দৃষ্টান্তটি একটি কৃত্রিম ব্যবহারকেই নির্দিষ্ট করছে। ব্যক্তি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে আড়াল করে সাময়িক প্রাপ্তি বা লাভালাভকেই বড় করে তুলেছেন। এর ফলে ব্যক্তি যে কৃত্রিমতার জালে জড়িয়ে পড়লেন তার থেকে নিষ্ক্রমণ কষ্টসাধ্য। ব্যক্তিকে এখন যথেষ্ট মাত্রায় শ্রম ও ধ্যানের দ্বারা নিজ অভীপ্সায় ফিরে আসতে হবে।

সাধনপথ ও সাধনলক্ষ্য নির্বাচনটি দীর্ঘমেয়াদী। তাই ব্যক্তির চরিত্র সম্মত ব্যবহারের পথেই এটির আবিষ্কার জরুরী। সংস্কার পর্যালোচনা করলেও এর অনেকগুলি মাত্রা পাওয়া যায়। অবশ্য বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র এটি নয়। আমাদের দায়িত্ব সংস্কারের মূল প্রবণতা ও চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য বুঝে নেওয়া এবং তার ভিত্তিতেই নির্বাচন পর্বটি সেরে ফেলা।

এতক্ষণ যে সব পদ্ধতির কথা আলোচনা হল এগুলি যুক্তিগ্রাহ্য পথ। যুক্তির ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া বুঝে নেওয়ার জন্য যেসঠিক নির্বাচনটি যাতে ব্যক্তির সংস্কার, রুচি ও চরিত্র সম্মত হয়। এরকমই সব সময় হতে হবে তা নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতিটি উপযোগী — কিন্তু সবক্ষেত্রেই নয়। নির্বাচনটি স্বতঃস্ফূর্তও হতে পারে। ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রজ্ঞা বা ভিতরে গুপ্ত ভক্তিধনের জাগরণের ফলে মুহূর্তে নির্বাচন হয়ে যায়। একেবারেই স্বতন্ত্র ধারার, স্বতন্ত্র পরিমাপের জীবনের মধ্যে থেকেও অকস্মাৎ মানসপটে নির্দিষ্ট হয়ে যেতে পারে ব্যক্তির অধ্যাত্ম অভীপ্সার পথ। সেই পথে যে পথে অগ্রসর হয়ে ব্যক্তি তাঁর সনাতনী প্রজ্ঞার জাগরণ ঘটাবেন অথবা সুপ্ত ভক্তিস্রোতকে বেগবতী করে তুলবেন। এই অকস্মাৎ বা স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণ ব্যক্তির উপর ভাগবতী কৃপার নির্দিষ্ট পরশ।

নির্বাচনের পদ্ধতি যাই হোক না কেন, নির্বাচন পর্বের পরই শুরু হয়ে যায় মনন পর্ব।

সাধনার দ্বিতীয় পর্ব ঃ মনন ঃ যিনি ভগবানকেই জীবনে চান, ব্রহ্মলাভ করতে উদ্‌গ্রীব, ভগবৎ সেবায় তৎপর তার পক্ষে মনন পর্বটি জরুরী। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ — যে মার্গই অবলম্বন করা হোক না কেন মনন জরুরী। অনেকে বলেন সাধনা পর্বটি যুদ্ধ, সাধন সমর। কেউ কেউ বলেন এটি কৃপার ক্রমঅবতরণ, কেউ বলেন এটি সুপ্ত চৈতন্যশক্তির সুষুম্নাপথে উত্থান ও গতিময় হয়ে সহস্রার অভিসারী হওয়া। আবার কেউবা বলেন এটি

নিত্য সেবক হয়ে যাওয়ার এক স্বর্গীয় আবহ। সাধন পর্বে যুদ্ধ অনিবার্য। উপনিষৎ একটি অনন্য উপায় ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ

ধনুঃ গৃহীত্বা ঔপনিষদম্ মহাস্ত্রম্
শরম্ হি উপাসানিশিতম্ সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তৎ-ভাব-গতেন চেতসা
লক্ষ্যম্ তৎ এব অক্ষরম্ সোম্য বিদ্ধি।। (মুণ্ডকোপনিষদ্ ২/২/৩)

[উপনিষদস্নাত মহামন্ত্রকে মহাস্ত্র করে সতত মননের দ্বারা তীক্ষ্ণ বান সন্ধান করতে হবে। চেতনাকে তাঁর ভাবমুখী করে সেই অক্ষর ব্রহ্মতে লক্ষ্য নিবদ্ধ করে যেতে হবে।]

এর পরেই উপনিষৎ আবার মননের উপর জোর দিয়ে বলছেন ঃ

প্রণবঃ ধনুঃ শরঃ হি আত্মা ব্রহ্ম তৎ-লক্ষ্যম্ উচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যম্ শরবৎ তন্ময়ঃ ভবেৎ।। (মুণ্ডকোপনিষদ্ ২/২/৪)

[ওঙ্কারই ধনু, আত্মাই শর, ব্রহ্ম এই শরের লক্ষ্য বস্তু। অপ্রমত্ত মনের একনিষ্ঠ অনুধ্যানই তাঁর স্পর্শ পেতে পারে]

মননই সেই অস্ত্র যার একনিষ্ঠ ও নিরবচ্ছিন্ন অনুধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধির সঞ্চার হয়। এটি সংগ্রাম এই অর্থে যে মননের সন্নিবেশ ব্যক্তির পক্ষে একটি তীব্র সংগ্রামের পর্ব।এই সংগ্রামটি ব্যক্তির অন্তর জগৎ ও বাইরের জগৎ উভয়েরই সঙ্গে। সংগ্রামটির প্রতিটি পর্বে ব্যক্তির সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক বাতাবরণ ক্রিয়া করে। 'লক্ষ্য স্থির হয়েছে' — এই ঘোষণার দ্বারা বোঝা যায় না যে প্রকৃতই লক্ষ্যটি নির্দিষ্ট হয়েছে কিনা। লক্ষ্য নির্দিষ্ট হলে ব্যক্তির অধ্যাত্ম জাগরণ পর্বও শুরু হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ। যে একাগ্রতা লক্ষ্য স্থির করবার জন্য প্রয়োজন সেটির জন্য চাই দীর্ঘ প্রস্তুতি। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ একাগ্রতা প্রসঙ্গে উপযুক্ত উদাহরণ। লক্ষ্যভেদে প্রয়োজন তন্ময়তা। এটিকেই শরবৎ তন্ময়তা বলা হয়। দৃষ্টি লক্ষ্যের প্রতি এমনভাবে নিবদ্ধ থাকবে যে অন্যত্র কোথাও কোনভাবেই দৃষ্টি নিক্ষেপিত হবে না। ব্রহ্মকেই যিনি জীবনের লক্ষ্য হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন তাঁকে ব্রহ্মভাবেই তন্ময় হয়ে উঠতে হবে। নিরন্তর ব্রহ্মচিন্তা মনের বাতাবরণে আনবে পরিবর্তন। মনের স্বাভাবিক জড়ত্বকে কাটিয়ে উঠে মন ক্রমশঃই চৈতন্য দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠবে। মনের ভূমিতে প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় নিবদ্ধ হবেন সাধক। ক্রমশঃ মনটি এখন ব্রহ্মজারণ ও ব্রহ্মচারণে পটু হয়ে উঠবে। ব্রহ্মভাবকে মন শুধু প্রশ্রয় দেবে না, নিয়ত তাঁকেই আশ্রয় করে মন বেড়ে উঠবে, গড়ে উঠবে। এটিই মনের মনন পর্ব।

এই মনন পর্বেই সাধকের দৃষ্টিতে ক্রমশঃ ব্রহ্মই সত্য এবং একমাত্র সত্য হয়ে উঠবেন। মননের দীপ্তিতে এবং মননের তীক্ষ্ণতায় মন এখন অন্য কিছুর প্রত্যাশী হবে না। মন এখন ব্রহ্মমুখী, ভগবৎমুখী। 'ভক্তি রথে চড়ি, লয়ে জ্ঞান তূণ....' মন এখন সংগ্রামে নিয়োজিত। মনন প্রক্রিয়ার এই সংগ্রামটির শেষ সমগ্রতায়। সংগ্রাম দিয়ে শুরু হয়ে সংগ্রামেই শেষ

নয়। যুদ্ধ ছিল, যুদ্ধ আছে. নিজের জড় প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ; অন্যান্য বিপরীতমুখী প্রবণতা ও প্রভাবের সঙ্গে যুদ্ধ; মনের দিব্যাংশের সঙ্গে জড়াংশের যুদ্ধ। কিন্তু পরিণাম যুদ্ধেই নয়; পরিণাম সামঞ্জস্যে — যেখানে জ্ঞান, ভক্তি, একাকার হয়ে যায়। মননের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতায় আর মার্গের তফাতটি থাকে না। তখন সব মার্গ তাঁতেই লীন হয়। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ হাত ধরাধরি করে এগিয়ে পড়ে ব্রহ্মান্বেষণে, ভগবৎলাভে। মননকে জাগিয়ে রাখবার জন্য, তীব্র, তীক্ষ্ণ করে তুলতেই প্রয়োজন হয় কোন না কোন মার্গের। যে মার্গ দিয়েই আমরা অগ্রসর হই না কেন, পরিশেষে মননই মার্গের রথ হয়ে দেখা দেয়। মার্গের রথটি মনন প্রক্রিয়ার সূচনা করেই ক্ষান্ত হয় না, মননকে ক্রমশঃই গাঢ়ত্ব ও ঘনত্ব দান করে। মনন নিবিড় হয়ে ওঠে। মনের বাহ্যিক সব বৃত্তিরোধকের পরও মনন থাকে।

মনন যেমন ব্যক্তি নির্ভর তেমনই বহুক্ষেত্রে পরিবেশ নির্ভর হয়ে ওঠে। ব্যক্তির ভিতরকার পরিবেশ এবং বাহ্যিক পরিবেশ উভয়ই মনন প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। কি ভাবছি, কি করছি, কি বলছি, কোথায় আছি, কেমন আছি, আর সকলেরই বা কেমন অবস্থা—এসবই মনের বাহ্যিক স্তরগুলিতে ফুটে ওঠে, আলোড়িত হয়। মনন প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যক্তির অধ্যাত্মদ্বার ক্রমে উন্মোচিত হয়। মনন যেন ছাদে ওঠবার সিঁড়ি। মননের সিঁড়ি বেয়েই গড়ে ওঠে তাঁর সঙ্গে যোগ। ক্রমে যোগটি অবিচ্ছেদ্য হয়ে যায়। ভক্ত তখন শুধু তাঁর ইষ্ট দর্শন করেন, আর ইষ্টের সেবায় তৎপর হন। জ্ঞানী তখন ব্রহ্মের প্রজ্ঞাভাস্বর রূপে জ্ঞানস্নান করেন আর যোগী পরব্রহ্মের ভাবে লীন হয়ে থাকেন। মনন এই যাত্রাপথকে করে তোলে দৃঢ় ও মসৃণ।

সাধনার তৃতীয় পর্ব ঃ অনুরাগ ঃ মনন থেকে অনুরাগ জন্মে। এখন আর অন্য কিছুর প্রতি মনোনিবেশ থাকে না। মনের মূল অভিনিবেশ চলে যায় ইষ্ট বা ব্রহ্মের প্রতি। মন এখন ব্রহ্মরস বা ভাগবৎরসে জারিত হতে চায়। মন ক্রমে ইষ্ট, ভগবান বা ব্রহ্ম চিত্তে তদ্‌গত হতে থাকে। মনের মধ্যেই উদয় হয় নতুন ভাব ও নতুন দ্যোতনা। মন এখন তাঁর প্রতি ক্রমে আরও বেশিমাত্রায় অনুরক্ত হয়ে ওঠে। সাধকের এখন অনুরাগের অবস্থা। সাধক এখন তাঁর কথায়, তাঁর নামে, তাঁর ভাবে শিহরিত হন। এখন ভাবে, রসে, জ্ঞানে, ধ্যানে সাধক শুধু তাঁরই অভিমুখী হয়ে ওঠে। অনুরাগ পর্বটি অতি গোপন। নিবিড় সান্নিধ্যে ব্যক্তি এখন তাঁকেই পেতে চায়। অনুরাগের রঙে রাঙিয়ে ওঠে ব্যক্তির তনু, মন, প্রাণ। এখন তিনি অনুরাগের প্রাবল্যে আন্দোলিত হ'তে পারেন অথবা শান্ত তন্ময় হয়ে তাঁর ভাবেই তদ্‌গত হয়ে থাকতে পারেন।

অনুরাগ প্রকাশে আসতেও পারে আবার নাও পারে। অনুরাগের চনমনে প্রকাশেই হয় ক্রমশ বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি। যেমন দাস্যভাব, যা হনুমানজীর ভাব হিসাবে খ্যাত। যেমন বাৎসল্য ভাব—যা মা যশোদার কৃষ্ণ বাৎসল্যে মূর্ত। যেমন মধুর ভাব—যেটি বৃন্দাবনের মূল ভাব। অনুরাগ ভাবের পাদভূমি। অনুরাগ থেকেই একেকটি ভাবের মূর্চ্ছনা

শুরু হয়। ভক্তের হৃদয়ে অনুরাগের জন্ম হলে তো আর কথাই নেই। এখন ভক্তির স্রোতোধারা ভক্তকে বয়ে নিয়ে চলে যাবে ভক্তির গহন সমুদ্রে সেই স্রোতোধারা যেখানে আছে শুধুই তাঁর পানে এগিয়ে চলা। এখন শয়নে, স্বপনে, কর্মে, জাগরণে শুধু তারই ভাবরসে ডুবে থাকা। তাঁর ভাবসমুদ্রের অবগাহনের প্রস্তুতি এই অনুরাগেই শুরু হয়। অনুরাগ হলে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা দূরে সরে যায়। অনুরাগ বিচ্ছেদের বীজকেও যেন নষ্ট করে দেয়। এখন শুধু তাঁর মাহাত্ম্যে ডুবে থাকা। তাঁর অবস্থা ও অবস্থান ভাবনা নিয়েই সাধক সবসময়ে ব্যস্ত এবং ভাবনিমজ্জিত থাকেন।

জ্ঞানীর শুষ্ক হৃদয়। জ্ঞানীর মত যোগীরাও। জ্ঞানী বা যোগীর অনুরাগ কেমনে হবে? অনুরাগ শুধুমাত্র ভাবে আন্দোলিত হওয়া নয়। জ্ঞানী বা যোগীর অনুরাগ হোল হৃদয়কন্দরে তাঁকে লালন ও ক্রমে তাঁরই প্রতিচ্ছবি অন্তরে অন্তরে সদ্যপ্রত্যক্ষ করা। জ্ঞানী জানেন ব্রহ্ম স্বয়ং আত্মারূপে এই অস্তিত্বের মধ্যে বিরাজিত, তিনি স্বয়ং সবকিছুই হয়েছেন। তিনিই স্থান, কাল, পাত্র। তিনি বৃহতে, আবার সেই তিনিই ক্ষুদ্রে। অণুতে তিনি যেমন রয়েছেন পূর্ণমাত্রায়, তেমনি রয়েছেন মহতে, বরিষ্ঠে, ব্যাপকতায়। তাঁর সান্নিধ্যেই আমরা সতত রয়েছি। এমন কোন ক্ষণ নেই যখন তাঁর সান্নিধ্য হয় না, এমন কোন স্থান নেই যেখানে তাঁর সান্নিধ্য মেলে না, এমন কোন অবস্থাও নেই যখন তাঁর সান্নিধ্য বঞ্চিত হতে হবে। ব্যক্তির উপলব্ধির আলোয় যখন তিনি ধরা দেন, তখনই তাঁর ভাবসান্নিধ্যে চলে আসেন ব্যক্তি। জ্ঞানী বা যোগীর উপলব্ধির সোপান যখনই শুরু হয়, তখনই এক অনাবিল অন্তঃসলিলার মত প্রবাহিত হতে থাকে অনুরাগের স্রোত। অনুরাগ পর্বটি স্থায়িত্ব নির্ভর করে উপলব্ধির সারল্য ও গাঢ়তার উপর। উপলব্ধি যতই গাঢ় হতে শুরু করে ততই অনুরাগের অগ্নি যেন প্রখরতর, তীব্রতর, উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। অনুরাগই এখন হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যায় ব্যক্তিকে তাঁর উদ্দিষ্ট সাধনপথে। অনুরাগটি যেন প্রাণবন্ত একটি শক্তি হিসেবেই কাজ করে, ব্যক্তিকে তাঁর উদ্দিষ্ট সাধন পথে আরও বেশি মাত্রায় এগিয়ে পড়ার প্রেরণাটি আনে। যেন তাঁকে না ভেবে আর একটি ক্ষণও চলছে না। এই, একটু সময় মিলেছে কাজের ফাঁকে, এখনই তাঁকে না ভেবে আর একটি ক্ষণও চলছে না। এই, একটু সময় মিলেছে কাজের ফাঁকে, এখনই তাঁকে ডাকি — যেন তাঁকে না ডাকলে সবই পণ্ড। তাঁকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার প্রয়াস। সেই তিনি নিরঞ্জন, নিরাকার, নির্বিশেষ হিসেবে যেন রূপহীন অস্তিত্ব হয়ে জ্ঞানীর নিকট তত্ত্বত ধরা দিচ্ছেন। অথবা যোগীর সমাহিত চিত্ত অবস্থায় তিনি যোগস্নাতরূপে ভাস্বর হয়ে উঠছেন।

অনুরাগের আকুতি, আবেগ ও প্রকাশ এখন ভিন্নতর। ভক্তের ক্ষেত্রে যেমনটি ছিল, এখানে তা নয়। অনুরাগ এখন বহুবিধ। প্রথমতঃ মার্গের সাধনধারার গভীরতম অংশে প্রবেশের তীব্র আকর্ষণ এখন ফুটে ওঠে। অনুরাগের পরশ সেখানেও লাগে। ফলে সাধক এখন তাঁর সাধনায় নিমজ্জিত থাকার ব্যাপারে কোনরূপ শিথিলতা দেখান না। তিনি সাধন

সাগরেই যেন ঝাঁপ দেন। সাধন সাগরের গভীর, গোপন তলদেশের প্রতি এক মূর্ত ও অনন্য আকর্ষণে সাধক ছুটে চলেন। সাধকের এখন অনন্যোপায় অবস্থা। ব্রহ্মভাবনা, ব্রহ্মসাধনা ছাড়া তিনি আর কীই বা করবেন? তাঁর করণীয় আর কী বা রয়েছে। তিনি যেন যন্ত্রচালিতের মতই ধ্যানে, সাধনে, ডুবে যান। সাধক এখন জীবনের অন্য সব অঙ্গনের তাৎপর্য খুঁজে পান শুধুমাত্র তাঁর সাধনে। এক তীব্র টান যেন সাধককে টেনে নিয়ে চলে ব্রহ্মভাবের সন্নিকটে। সাধকের ভিতরে চৈতন্য শক্তি এখন সাধন সমন্বয়ে ব্রতী।

সাধন সমরটি ছিল শুরুতে। প্রবৃত্তি , স্বভাব, চারিত্রিক গুণাবলী, আন্তর ও বাহ্যিক পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম দিয়েই যাত্রার শুরু। এখন অনুরাগের আবেশে সংগ্রামটি রূপান্তরিত হয়ে ওঠে সাধন সমন্বয়ে। তাঁর প্রতি পরম অনুরাগেই তার দিকে মুখ ফেরান, তাঁকে একমাত্র করে তোলা, ধ্যানে, জ্ঞানে। ব্রহ্মের শাশ্বত অস্তিত্ব এখন সাধককে যেন শুধুমাত্র আচ্ছন্ন করে রেখেছেন তাই নয়, যেন অধিকার করেছেন। সাধক এখন ব্রহ্মমুখী। জগৎ আলাদা করে সাধকের চৈতন্যে বৃত নয়, ব্রহ্মের অস্তিত্ব রয়েছে বলেই জগৎ সাধকের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য। তিনি সব হয়েছেন, সবেরই মধ্যে রয়েছেন, তাই তাঁর প্রতি অনন্য অনুরাগবশতই সাধক এখন শুধুমাত্র তাঁরই ধ্যানে সদা নিয়োজিত। সাধক এখন সমপর্ণের জন্য প্রস্তুত।

সাধনার চতুর্থ পর্ব ঃ সমর্পণ ঃ অনুরাগের গাঢ়তায় সাধক এখন আত্মবিলোপ ও আত্মসমর্পণে প্রস্তুত। সমর্পণেই সাধনার পরিণতি। সমর্পণের আহ্বান জানিয়ে অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাগবৎগীতায় বলেছেন ঃ

যৎ করোষি যৎ অশ্নাসি যৎ জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মৎ-অর্পণম্।।

(শ্রীমদ্‌ভাগবৎগীতা, ৯/২৭)

[হে কুন্তিপুত্র, যা কিছু কর্ম কর, যা কিছু ভোজন কর, যা কিছু যজ্ঞাদি কর, যা কিছু দান কর, যা কিছু তপস্যা কর, সে সবই আমাকে অর্পণ করেই করবে।]

সমর্পণের প্রয়াস ও উদ্যোগের প্রেক্ষিত হল ভক্তি। অনুরাগ গাঢ় হলেই ভক্তি বা জ্ঞানও গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ভক্তের দৃষ্টিতে ভক্তিই এ পথের সার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ প্রদর্শনের পরই অর্জুনকে বলেছিলেন যে বিশ্বরূপ অর্জুন দেখলেন তা দেবতাদেরও দুর্লভ দর্শন। বেদাদি শাস্ত্র চর্যার দ্বারা বা পূজাদি কর্মের দ্বারা এই রূপদর্শন সম্ভব নয়। এটি ভক্তির ধন। অনন্যাভক্তির অধিগম্য বিশ্বরূপ দর্শন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

ভক্ত্যা তু অনন্যয়া শক্যঃ অহম্ এবং বিধঃ অর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ।। (শ্রীমদ্‌ভাগবৎগীতা, ১১/৫৪)

[হে অর্জুন, আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন, আমাতে একীভূত হতে ও তত্ত্বত আমাকে জানতে হলে অনন্যাভক্তির প্রয়োজন।]

অনন্যাভক্তির দ্বারাই ভগবানের উপলব্ধি লাভ, তাঁকে দর্শন ও লাভ করা যায়। অনন্যাভক্তি থেকেই ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানের উন্মেষ ঘটে। অনন্যাভক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের পথ। শ্রীমদ্‌ভাগবৎগীতা ভক্তির ও জ্ঞানের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ভক্তির সোপানেই আসে সমর্পণ। তখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিই কর্ণে প্রবেশ করে আর কোন ধ্বনিই শ্রবণে আসে না। এখন চোখ শুধু তাঁকেই দেখে, কান শুধু তাঁরই কথা শোনে, বাক্ শুধু তাঁর কথাই বলে। সমস্ত তনু, মন প্রাণ নিয়েই সাধক তাঁর কাছে ছুটে চলেন সমর্পণের আত্মহারা দুর্বার গতিতে। উজাড় করে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চান। সাধক এখন বিলীন হয়ে যেতে চান ব্রহ্মসমুদ্রে। ভক্তি নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে মেলে ধরেন তাঁর ইষ্টের সেবায়, ইষ্টের তৃপ্তিমানসে। ভক্ত তাঁর আকারটির অস্তিত্ব বজায় রাখেন শুধুমাত্র তাঁর সেবার জন্য। ভক্তের মেলে দেওয়া সেবার ডালি তাঁর পরম প্রিয়। তাই তিনি আহ্বান ধ্বনি দিয়ে ভক্তকে আকর্ষণ করেন। ভাগবত এরকমই বর্ণনা দিয়েছেন রাসলীলার সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির আহ্বানে গোপীজনের ছুটে যাওয়াকে। বাঁশী বাজছে যেন গোপীদের হৃদয়কন্দরে, আর সেই আহ্বানেই গোপী ছুটে চলেছেন কৃষ্ণের অভিমুখে।

নিশম্য গীতং তৎ অনঙ্গবর্দ্ধনম্
ব্রজাস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুঃ অন্যোন্যং অলক্ষিত-উদমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ।। (ভাগবত ১০/২৯/৪)

[শিহরণ জাগা ; বংশীগীত শুনে ব্রজবাসিনীগণ পরস্পরের অলক্ষ্যেই উদ্দাম গতিতে, আন্দোলিত আভরণ শরীরে কৃষ্ণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ছুটে গেলেন।]

ব্রজগোপীরা এখন দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য। এঁদের দেহ বোধ উধাও। উবে গেছে সমাজ, সংসার আর বৃহত্তর জগৎ। এঁরা শুধুমাত্র কৃষ্ণকেই জানেন ও মানেন। তাই কৃষ্ণ মিলনই এঁদের প্রথম কাজ। কৃষ্ণমিলনে যে কৃষ্ণসেবা সম্ভব হবে একমাত্র সেই বোধটিই জাগ্রত চেতনায় রয়েছে। গোপীজনদের কৃষ্ণভাব সার এঁদের জীবনে। কৃষ্ণতৃপ্তিই এঁদের একমাত্র কাম্য ও লক্ষ্য। কৃষ্ণের জন্যই এঁরা সকলে সমর্পিত প্রাণ। কৃষ্ণের তৃপ্তি ও স্ফূর্তি এঁদের সর্বোত্তম সম্পদ ও আনন্দ। কৃষ্ণসেবায় এভাবে তৎপর গোপীজন স্ব স্ব জীবনের কোনও আঙিনাতেই দায়বদ্ধ নন। এঁরা সমর্পিত প্রাণ। কৃষ্ণের সুখের জন্য এঁরা নিজেদেরকে করেছেন পূর্ণ সমর্পণ। এই সমর্পণই তাঁদের সাধন-নিবেদন। সমর্পণের পথেই এঁদের অন্তিম সিদ্ধি। গোপীদের অন্তিম সিদ্ধি কৃষ্ণপ্রাপ্তি; কৃষ্ণপরিষেবা এবং কৃষ্ণপরিষেবা এবং কৃষ্ণবিলাস। এই প্রাপ্তির কোথাও নিজ অহংজাত কামনার ঠাঁই নেই। তাই গোপীদের সাধন পর্বটি কামনাবিহীন পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। এটি সমর্পণের পরিণতি। ভক্তের পক্ষে যেমন সমর্পণ জরুরী, তেমনি জ্ঞানীর পক্ষেও। ভক্তের কাছে সমর্পণের পাত্র রূপধারী ভগবান। গোপীজনমনবল্লভ কৃষ্ণসুন্দরের কাছে গোপীগণ সমর্পিত। ব্রজগোপীরা নিরন্তর কৃষ্ণধ্যানেই

রত। কৃষ্ণধ্যান, কৃষ্ণজ্ঞানই এঁদের সর্বস্ব। 'কানু বিনা গীত নাই'—কৃষ্ণ বিনা গোপীদের নেই আর কোন ভালবাসার পাত্র, সমর্পণের ক্ষেত্র। তাই তাঁরা সব পরিত্যাগ করেই ছুটে চলেছেন। কোন গোপী ব্যস্ত ছিলেন রান্নার কাজে, ঘর-গৃহস্থলীর কাজে। কৃষ্ণের বাঁশী শুনেই ছুটলেন। যে কাজটি যে অবস্থায় ছিল সেটিকে সে অবস্থায়ই রেখে ছুটলেন, রান্নার খুন্তি হাতে ছুটেছেন গোপী। কোন গোপী শিশুকে খাওয়াচ্ছিলে, ছুটলেন সেই অবস্থাতেই। কেউবা স্বামীসেবায় ব্যস্ত ছিলেন। কৃষ্ণের বাঁশীর ডাক কোন কাজ বা অবস্থায় গোপীদের সংযত করতে পারেনি। এঁরা সকলেই ছুটেছেন বংশীধ্বনি অনুসরণ করে কৃষ্ণপানে। আত্মহারা প্রেমে গোপীরা ছুটেছেন কৃষ্ণবহ্নিতে নিজ সত্তার সমর্পণ মানসে।

ভক্তের এই সুবিধাটি রয়েছে। ভগবান বিগ্রহবান হয়ে তাঁর সঙ্গে লীলার্থী। তিনি স্বয়ংই আহ্বানটি করছেন। জ্ঞানীর পক্ষে আহ্বানটি একটি অনাহত ডাক। জ্ঞানী তাঁর হৃদয়কন্দরের অতলগহ্বরে তাঁকে দেখেন। দেখেন সেই নিবাত-নিস্কম্প দীপশিখা হৃদয়গুহার ঘনান্ধকারকে দীপ্ত আলোয় করেছেন উদ্ভাসিত। জ্ঞানীর দিক বিচার, বস্থা বা অবস্থান বিচার চলে যায়। তিনি এখন এই দীপশিখার আলো ও অগ্নিতে হতে চান নিবেদিত। জ্ঞানীর প্রজ্ঞা ভাস্বর সত্তাটি এখন শুধু পরব্রহ্মের ভাবধ্যানে নিরত রয়েছেন। গভীর ধ্যান নিমগ্ন জ্ঞানী তাঁর প্রজ্ঞায়, চৈতন্যদীপ্তিই তাঁরই সাহচর্য করে চলেছেন। জ্ঞানীর জগৎটি এখন ঐ সচ্চিদানন্দাশ্রয়ী হৃদয় গুহাটি, যেখানে স্বয়ং তিনি স্বনির্বাচিত একটি অনবদ্য গীতি সুষমায় বিধৃত। জ্ঞানীর বাহ্য চৈতন্য এখন লুপ্ত, তিনি সমর্পণ যজ্ঞে সমাহিত। জ্ঞানের দীপ্তিতে জ্ঞানী বুঝেছেন সচ্চিদানন্দই সব হয়েছেন। তিনি সবই হয়েও আবার সবকিছুরই অগম্য রয়ে গেছেন। তাঁকে জানতে হলে, চিনতে হলে তাঁর দাপ্তিতেই করতে হয়। তাঁকে তাঁর আলোয় দেখতে হয়। সেজন্যই চাই ষট্‌চক্রভেদ, চাই সাধনার প্রখরতা, চাই অনুরাগের গাঢ়তা। তাঁর দীপ্তিকে চিনে নেওয়া, বুঝে নেওয়ার জন্য চাই তাঁর উপলব্ধির ফল্গুধারা। উপনিষদ বলছেন ঃ

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।। (মুণ্ডকোপনিষদ্, ২/২/১০)

[সূর্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। তারকারাজি ও চন্দ্রের দীপ্তিও তাঁর কাছে পৌছায় না; বিদ্যুৎ তাঁকে বিভাসিত করতে পারে না; ক্ষুদ্র অগ্নিরই সাধ্য কতটুকু! তিনি স্বয়ং দীপ্যমান। তাঁরই দীপ্তিতে আবিশ্ব উদ্ভাসিত হয়।]

জ্ঞানীর প্রশান্ত প্রজ্ঞায় ভাস্বর হয়ে ওঠে ব্রহ্মের প্রকাশরূপ। তিনি হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটাতে তৎপর হন। ব্রহ্মানুভবের দীপ্তিতে জ্ঞানী এখন সচেষ্ট হন তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিসমাপ্তিতে। জ্ঞানী সাধক এখন সমাহিত চিত্তে ব্রহ্ম ভাবে ভরপুর হয়ে রয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে এখন সকলই ব্রহ্মময়, তাই মধুময়। আনন্দময় সত্তার আনন্দ বিলাসের তনু হয়ে

ওঠে সাধকের অস্তিত্বটি। সাধক এখন পূর্ণ সমাহিত, সমর্পিত। এঁর স্বাতন্ত্র্য এখন লুপ্ত। সাধকের অস্তিত্বটি আকারমাত্র। এঁর আলাদা পরিচয় রয়েছে নামমাত্র। সাধক পূর্ণজ্ঞানে ভাস্বর হয়ে ব্রহ্মে সমর্পিত হয়েছেন। এখন যা কিছু জগৎকর্ম তাঁর রয়েছে সেটি যেন অপ্রয়াসজাত, অনায়াস সম্ভূত। সাধক আর কিছু জানেন না। ব্রহ্মভাবই তাঁর সার। হনুমানজি যেমন বলেছিলেন, বার, তিথি, নক্ষত্র, জানিনা, জানি শুধুই রাম। সাধকের প্রজ্ঞায় আর কিছুই নেই আছেন শুধুই ব্রহ্ম।

বাহ্য প্রকৃতি এবং পরিষেবা সাধককে প্রভাবিত করতে পারে না। বাহ্য প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য যে আন্তর সহযোগ প্রয়োজন সাধক তা দেন না। সহযোগ ততটুকুই আসে সাধকের কাছ থেকে যা ভাগবতী জীবনের অনুগ। সাধক এখন ভাগবতী জীবনে ব্রতী। জড় জগতের কাছে তাঁর কিছুই নেই প্রাপ্তির বা অপ্রাপ্তির। সাধক সব চাওয়া পাওয়ার অতীত এক জীবন যাপন করছেন এখন। যেসব চাওয়া পাওয়া স্বাভাবিক জীবন, সাধক তার থেকেও বহু দূরে অবস্থান করছেন। তাঁর আর কিছু হওয়ারও নেই। তাই হওয়ার জন্যও তাঁর নেই কোন প্রেরণা বা অনুশোচনা। তীব্র যন্ত্রণাক্লিষ্ট দেহেও তাই তাঁর অনন্য ভগবৎ তন্ময়তা বিরাজ করে। তিনি এক অখণ্ড যোগে বৃত। ব্রহ্মজীবনের এটি প্রতিচ্ছবি। সাধক ব্রহ্মময় জীবনের অধিকারী। ব্রহ্মই তাঁকে যেন আবেষ্টন করে সমগ্র ভাবকে করেছেন ব্রহ্মভাবে বিভোর। তাই সাধক এখন সম্পূর্ণ নিবেদিত একটি প্রাণ।

এই অবস্থায় তাঁর ভাবটি এরকম—নিজে কিছুই জানেন না, পারেন না, করেন না। তীব্র কর্মপ্রবাহের মধ্যে থেকেও তিনি কর্মে লিপ্ত নন। তিনি সবটাই সঁপে দিয়েছেন। তাই সবসময়েই ভগবৎ ইচ্ছার অধীন তিনি। তাঁর ভাল বা মন্দ বলতে যেন কিছুই নেই। তিনি না চান ভাল, না মন্দ। ভাল, মন্দের অতীত তিনি। সবটাই ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা চালিত। সাধকের জীবনে এখন পরম সত্য, পরম জ্ঞান মাখামাখি করে আছে এক অমূর্ত প্রাণ-শরীরে। তিনি নিজে জীবনকে পরিচালনা করেন না, পরিচালিত হন। তাঁর জীবনে, এই বিশ্বভূমিতেই ফুটে ওঠে দিব্য জীবনের দ্যোতনা। সমর্পিত প্রাণ সাধক প্রকৃতই দিব্য জীবনের অধিকারী।

সাধন বৈচিত্র্য ঃ ভক্ত, যোগী বা জ্ঞানীর সাধন পথ অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতার মধ্যে ফুটে তাঁর নিজস্বতা। সাধন পথ যেমন ব্যক্তির রুচি বৈচিত্র্যের জন্য বিভিন্ন হয়। তেমনি সাধন লভ্য অভিজ্ঞতাও হয় ভিন্ন। প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। ভক্ত, জ্ঞানী, যোগী প্রত্যেকই নিজ নিজ সাধনমার্গের স্বতন্ত্র ধারায় স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতায় বিধৃত। তাই সাধনজাত উপলব্ধিও বিভিন্ন।

পথ বা ধারা যেটিই হোক না কেন সাধনার পথে অগ্রসর হয়ে সকলেই একেকটি বিশিষ্টতা এনে দেবে সাধনপর্বে। সাধনের অনুকূল বাতাবরণ এর ফলে তৈরি হবে। ব্যক্তির অন্তর্জগতে জাগরণ ও চৈতন্য প্রবাহ এখন বাইরের জগৎ এবং সমাজকেও প্রভাবিত,

পল্লবিত করবে। সব সাধন পথ ও অভিজ্ঞতাই মূল্যবান। সব সাধন পথ ও অভিজ্ঞতারই মিলিত ফসল একটি সাধন ঐতিহ্য বা পরম্পরা। সাধন ঐতিহ্য ও পরম্পরায় বৃত ভাগবতী পরিবেশই সাধন সম্পদকে প্রসারিত করে।

বৈচিত্র্য যেমন সাধকের আন্তরসংস্কার বা প্রকৃতি থেকে আসে অথবা তত্ত্বধারায় আসে, তেমনি আসে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ অভিজ্ঞতার নিরিখে। সাধন বৈচিত্র্য সাধনার ধারাগুলির মধ্যে সংঘাতের সম্পর্ক আনে না। তেমনি সমগ্রতায় বিধৃত হতে পারে প্রতিটি ধারা। প্রকৃত ভগবৎ অভিজ্ঞতার অধিকারী সাধকের কাছে মার্গের গুরুত্ব থাকে না। এঁর দৃষ্টিতে রয়েছে শুধুই ব্রহ্ম, ভগবান বা ইষ্ট। পথের সমর প্রক্রিয়ার অতীত ইনি। সাধনসিদ্ধি সাধনসমগ্রতার বোধ সকলের জন্যই এনে দেয়। ভাগবতী অভিজ্ঞতার আলোকেই জেনে নিতে হবে সাধন ও সাধ্য একই সত্যেরই দু'টি প্রতিফলন। একই ফলের দু'টি পার্শ্ব। সাধ্য ও সাধনের অবিনাভূত অবস্থায় বৈচিত্র্যের প্রকৃত রূপটি ফুটে ওঠে।

সাধনার এই পথ বৈচিত্র্যসমূহ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে অন্য পথও। যার সহজ-সরল-ঐকান্তিক ভালবাসা ও নিবেদন রয়েছে ভগবানের জন্য, তার নিজের উদ্যোগ আর প্রয়োজন হয় না। ভগবান তার নিত্য সাথি।

শ্রী বিমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাগুলি ভগবৎ পথে সবাইকে আহ্বান করবে; আর প্রেরণা যুগিয়ে দেবে ভাগবতী ভাব অর্চনার, স্বাভাবিক জীবনে।

August, 15, 2021
Kolkata–91

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক, সত্যের পথ
www.satyerpath.org